ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-VI, July, 2026, Page No. 2243-2252
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.06W.487

'পদিপিসীর বর্মিবাক্স'– এ কৌতূহল, ভয়, স্বপ্ন, রহস্যচেতনা: ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের আলোকে একটি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

দীপক দে, *অতিথি প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, রামঠাকুর কলেজ, আগরতলা, ত্রিপুরা, ভারত*

Received: 10.07.2026; Accepted: 16.07.2026; Available online: 31.07.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper presents a psychoanalytic reading of Leela Majumdar's 'Podipisir Bormi Baksho' through the theoretical framework of Sigmund Freud, with particular emphasis on the psychological dimensions of curiosity, fear, dreams, and the sense of mystery. The study argues that these interconnected psychological elements constitute the central driving force of the narrative and significantly shape the child narrator's mental development. Employing Freud's concepts of the conscious, preconscious, and unconscious mind, the paper explores how the narrator's curiosity is awakened by fragmented information, mysterious family stories, and unexplained incidents surrounding the lost Burmese box. As the narrative progresses, these experiences are stored in the preconscious mind, while fear, imagination, and dream experiences reveal the dynamic operation of the unconscious. The dream episodes are interpreted as symbolic manifestations of hidden desires, anxieties, and repressed thoughts, reflecting Freud's view of dreams as the "royal road" to the unconscious. Furthermore, the novel demonstrates how mystery functions not only as a narrative technique but also as a psychological catalyst that transforms fear into the motivation for exploration and discovery. The eventual recovery of the Burmese box symbolizes the successful integration of conscious reasoning, accumulated memory, and unconscious intuition, thereby resolving both the external mystery and the narrator's internal psychological conflict. The paper concludes that Podipisir Bormi Baksho transcends the conventional limits of children's mystery fiction and emerges as a psychologically profound literary work, offering valuable insights into the complexities of the child mind and establishing its significance within the field of psychoanalytic literary criticism.

Keywords: Psychoanalysis, Sigmund Freud, Podipisir Bormi Baksho, Leela Majumdar, Curiosity, Fear, Dreams, Mystery, Unconscious Mind, Children's Literature

মানব জীবনের এক অপূর্ব শিল্পরূপ হল সাহিত্য। মানুষের জীবন, অনুভূতি, কল্পনা ও অভিজ্ঞতা বহু বিচিত্র আঙ্গিকে সাহিত্য-রূপ লাভ করে; এমনকি মানুষের বাহ্যিক জীবনযাত্রার পাশাপাশি তার মনোজগতের নানা আবেগ, আকাঙ্খা, ভয়, স্বপ্ন, কৌতূহল এবং মানসিক দ্বন্দ্বও সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বিষয়। বিশেষত শিশু-কিশোর সাহিত্য এমন একটি সাহিত্যধারা, যেখানে কাহিনির রোমাঞ্চ, কল্পনার বিস্তার এবং রহস্যের পাশাপাশি শিশুমনের স্বাভাবিক মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতাগুলিও অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে প্রতিফলিত হয়। একটি সফল শিশু-কিশোর

সাহিত্যকর্ম শুধু বিনোদন দেয় না; বরং শিশুমনের অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলে, অজানাকে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করে, ভয়কে অতিক্রম করার সাহস শেখায় এবং বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে একটি সৃজনশীল সেতুবন্ধন গড়ে তোলে।

শিশুর মানসিক বিকাশের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো কৌতূহল। এই কৌতূহল থেকেই জন্ম নেয় অনুসন্ধিৎসা, আর অনুসন্ধিৎসাই তাকে রহস্যের সন্ধানে পরিচালিত করে। অজানা পরিবেশ, পুরোনো বাড়ি, গোপন বস্তু, অদ্ভুত মানুষ কিংবা অপ্রত্যাশিত ঘটনা শিশুমনে যেমন বিস্ময়ের সৃষ্টি করে, তেমনি ভয়েরও জন্ম দেয়। কিন্তু এই ভয় শিশুকে থামিয়ে দেয় না; বরং অনেক সময় সেই ভয়ই রহস্য উদ্ঘাটনের প্রেরণায় পরিণত হয়। আবার মানুষের ঘুমন্ত অবস্থায় যে স্বপ্নের জগৎ তৈরি হয়, তা তার অন্তর্লৌকিক অনুভূতি, দমিত ইচ্ছা, উদ্বেগ ও কল্পনার এক বিশেষ প্রকাশ। ফলে কৌতূহল, ভয়, স্বপ্ন এবং রহস্যচেতনা— এই চারটি উপাদান শিশু-কিশোর সাহিত্যে পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।

এই মানসিক উপাদানগুলিকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে আধুনিক মনোবিজ্ঞানে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বগুলির একটি হলো অস্ট্রিয়ার মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬–১৯৩৯) প্রবর্তিত মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব (Psychoanalytic Theory)। ১৮৯৬ সালে তিনি ‘Psychoanalysis’ বা মনঃসমীক্ষণ পরিভাষাটির প্রবর্তন করেন। তাঁর মতে, মানুষের আচরণ, অনুভূতি, চিন্তা, স্বপ্ন এবং ব্যক্তিত্বের প্রকৃত উৎস নিহিত রয়েছে মনের গভীর স্তরগুলিতে। তাই মানুষের বাহ্যিক আচরণকে বোঝার জন্য তার অন্তর্জগতের বিশ্লেষণ অপরিহার্য।

ফ্রয়েড মানব মনকে একটি গভীর সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সমুদ্রের উপরিভাগ যেমন চোখে দেখা যায়, তেমনি মনেরও একটি দৃশ্যমান স্তর রয়েছে; আবার তার নীচে রয়েছে আরও বিস্তৃত ও অদৃশ্য স্তর। এই ধারণার ভিত্তিতেই তিনি মনের তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন— সচেতন মন বা স্বজ্ঞান স্তর (Conscious), প্রাক্-চেতন মন বা অসংজ্ঞান স্তর (Pre-conscious) এবং অচেতন মন বা নিজ্ঞান স্তর (Unconscious)। এই তিনটি স্তর পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং মানুষের মানসিক কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে।

(১) সচেতন মন: মনের সর্বোচ্চ ও প্রত্যক্ষ স্তর হল স্বজ্ঞান বা সচেতন মন। মানুষ যখন জাগ্রত অবস্থায় থাকে এবং তার চারপাশের পরিবেশ, চিন্তা, অনুভূতি কিংবা কাজ সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে অবগত থাকে, তখন সেই মানসিক অবস্থাকে সচেতন স্তর বলা হয়। বাস্তব জীবনের সঙ্গে মানুষের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এই স্তরের মাধ্যমেই ঘটে। আমরা যে বিষয়গুলি মুহূর্তে উপলব্ধি করি, বিচার করি কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, সেগুলি এই সচেতন স্তরের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ মানুষের সক্রিয় মানসিক জীবন এবং বর্তমান অভিজ্ঞতার কেন্দ্র হলো এই সচেতন মন।

(২) প্রাক্-চেতন মন: ফ্রয়েডের মতে, সচেতন ও অচেতন মনের মধ্যবর্তী স্তর হল অসংজ্ঞান বা প্রাকচেতন। এটি এমন একটি মানসিক ক্ষেত্র, যেখানে সেই সমস্ত স্মৃতি, অভিজ্ঞতা ও তথ্য সঞ্চিত থাকে, যা বর্তমানে আমাদের চেতনায় উপস্থিত না থাকলেও সামান্য চেষ্টা বা স্মরণ করলেই পুনরায় সচেতন মনে ফিরে আসে। অর্থাৎ এই স্তর একদিকে সচেতন মনের সঙ্গে, অন্যদিকে অচেতন মনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে। কোনো অভিজ্ঞতা বা স্মৃতি যদি অচেতন স্তরে প্রবেশ করে, তবে তা প্রথমে প্রাকচেতন স্তর অতিক্রম করে। একইভাবে, অচেতন স্তরে থাকা অনেক বিষয়ও প্রাকচেতনের মাধ্যমে সচেতন স্তরে ফিরে আসতে পারে। এই প্রসঙ্গে সুনীল কুমার সরকার তাঁর ‘ফ্রয়েড’ গ্রন্থে লিখেছেন—

> “অবচেতন মন বা preconscious হল মনের দ্বিতীয় স্তর। অবচেতন মন পূর্ব চেতন ছিল, এখন সুপ্ত অবস্থায় আছে। চেতন মন বা conscious এর পরিধি থেকে এর পরিধি অনেক

বড়। যেসব জিনিস আগে চেতন মনে ছিল, এখন নাই, অথচ যেগুলো একটু চেষ্টা করলেই আবার চেতন মনে আনা যায়, সেসব জিনিস অবচেতন মনে আছে।"[১]

এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, প্রাক্-চেতন মন স্মৃতি সংরক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর, যা প্রয়োজন অনুযায়ী অতীত অভিজ্ঞতাকে বর্তমান চেতনায় ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে।

(৩) অচেতন মন: ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক ধারণা হল অচেতন মন। তাঁর মতে, মানব মনের সবচেয়ে বিস্তৃত, গভীর এবং শক্তিশালী স্তর এটি। মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন তার সচেতন মন বিশ্রামে থাকলেও অচেতন মন কখনও নিষ্ক্রিয় হয় না। বরং এই স্তর সর্বদাই সক্রিয় থেকে মানুষের স্বপ্ন, কল্পনা, আকাঙ্ক্ষা এবং অবদমিত ইচ্ছার প্রকাশ ঘটায়। তাই স্বপ্নকে ফ্রয়েড অচেতন মনের অন্যতম প্রধান প্রকাশরূপ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

ফ্রয়েডের মতে, মানুষের জীবনের বহু অভিজ্ঞতা, স্মৃতি, ব্যর্থতা, যন্ত্রণা, ভয় কিংবা সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য কামনা-বাসনা সচেতন মন থেকে চাপা পড়ে অচেতন স্তরে আশ্রয় নেয়। এগুলি কখনও সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় না; বরং অচেতন মনের গভীরে সুপ্ত অবস্থায় থেকে সুযোগ পেলেই বিভিন্ন প্রতীকী রূপে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে।

অচেতন মনের সঙ্গে অবদমন ধারণার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মানুষ যেসব ইচ্ছা, কামনা, ভয় বা স্মৃতিকে সামাজিক, নৈতিক কিংবা ব্যক্তিগত কারণে প্রকাশ করতে চায় না, সেগুলি অবদমিত হয়ে অচেতন স্তরে সঞ্চিত থাকে। কিন্তু এই অবদমিত অনুভূতিগুলি কখনও সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয় না; বরং স্বপ্ন, দিবাস্বপ্ন, আচরণগত ভুল কিংবা মানসিক সমস্যার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে প্রকাশিত হয়।

অতএব, ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব অনুসারে মানুষের ব্যক্তিত্ব, আচরণ ও মানসিক বিকাশকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে হলে সচেতন, প্রাকচেতন এবং অচেতন— এই তিনটি স্তরের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষত অচেতন মনই মানুষের মানসিক জীবনের সবচেয়ে গভীর ও প্রভাবশালী স্তর, যা তার স্বপ্ন, কল্পনা, আচরণ এবং সাহিত্যসৃষ্টির অন্তর্নিহিত প্রেরণাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ক. কথকের কৌতূহল ও রহস্যচেতনার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ:

সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের অন্যতম মৌলিক ধারণা হলো মানুষের সমস্ত আচরণ কেবল তার সচেতন মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না; বরং প্রাকচেতন ও অচেতন মনও সমানভাবে মানুষের চিন্তা, অনুভূতি, সিদ্ধান্ত এবং আচরণকে পরিচালিত করে। মানুষের মনের গভীরে সুপ্ত অবস্থায় থাকা আকাঙ্ক্ষা, ভয়, স্মৃতি, কল্পনা এবং অবদমিত ইচ্ছাগুলি সুযোগ পেলেই বিভিন্ন প্রতীকী রূপে আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিথযশা শিশুসাহিত্যিক লীলা মজুমদারের 'পদিপিসীর বর্মিবাক্স' এই মনস্তাত্ত্বিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এক অসাধারণ উপন্যাস। এর কথাবয়ানে কৌতূহল, ভয়, স্বপ্ন ও রহস্যচেতনা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে এমনভাবে যুক্ত যে, একটিকে অন্যটির থেকে পৃথক করা যায় না। বরং একটির ভিতর থেকেই আরেকটির জন্ম হয়েছে এবং এই ধারাবাহিক মানসিক বিকাশের স্তর পরম্পরাই গল্পটিকে কেবল রহস্যকাহিনি না রেখে মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের স্তরে উন্নীত করেছে।

গল্পের সূচনাতেই কথকের সচেতন মন পদিপিসীর বর্মিবাক্স সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। মানুষের সচেতন মন সর্বদা বাস্তব তথ্যের অনুসন্ধান করে। পদিপিসীর হারিয়ে যাওয়া বাক্স, পরিবারের সকলের রহস্যময় আলোচনা, পুরোনো বাড়ির অদ্ভুত পরিবেশ এবং প্রত্যেকের গোপন আচরণ কথকের সচেতন মনে এক প্রবল অনুসন্ধিৎসার সৃষ্টি করে। প্রথমদিকে এই কৌতূহল নিছক শিশুসুলভ বলে মনে হলেও ধীরে ধীরে তা জ্ঞানলাভের

এক গভীর আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়। ফলে কথক শুধু গল্প শোনাতেই সন্তুষ্ট থাকে না; সে নিজেই রহস্যের সমাধান করতে চায়।

গল্পের প্রারম্ভেই দেখা যায়, কথক তার পাঁচুমামার সঙ্গে ট্রেনে চড়ে মামার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। যাত্রাপথেই পাঁচুমামার মুখে সে প্রথম শোনে রহস্যময় পদিপিসীর বর্মিবাক্সের কথা। বাক্সটিকে ঘিরে পাঁচুমামার কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা কথকের মনে প্রবল আগ্রহ ও বিস্ময়ের জন্ম দেয়। পাঁচুমামা বলতে শুরু করেন—

> "একশো বছর পরে পদিপিসীর আমি আবিষ্কার করব। জানিস, তাতে এক-একটা পান্না আছে এক-একটা মোরগের ডিমের মতন, চুনী আছে এক-একটা পায়রার ডিমের মতন, মুক্তো আছে হাঁসের ডিমের মতন। মুঠো-মুঠো হীরে আছে, গেছো-গেছো মোহর আছে। তার জন্য শত-শত লোক মারা গেছে, রক্তের সালওয়েন নদী বয়ে গেছে, পাপের উপর পাপ চেপে পর্বত তৈরি হয়েছে– সব আমি একা উদ্ধার করব।"[২]

সঙ্গে সঙ্গেই কথকও আগ্রহের সুরে বলে উঠে— "ও পাঁচুমামা, পদিপিসীর বর্মিবাক্সটা কোথায় আছে?"[৩] তারপর পাঁচুমামার কণ্ঠে পদিপিসীর রহস্যাবৃত চারিত্রিক বর্ণনা কথকের কৌতূহল আরও বাড়িয়ে দেয়। কথক বলেন— "দেখ্ মামাবাড়ি তো যাচ্ছিস। সেখানকার গোপন সব লোমহর্ষণ কাহিনীগুলো তোর জানা দরকার এ কথা কখনো ভেবে দেখেছিস? পদিপিসীর নাম ইতিহাসে রক্তের অক্ষরে লেখা থাকতে পারত তা জানিস?"[৪]

কথক মামাবাড়ি পৌঁছে পরিবারের সকলের অদ্ভুত ও রহস্যময় আচরণ দেখে বিস্মিত হলেন। ফ্রয়েডের মতে, মানুষের সচেতন মন বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিচালিত হয়। কথকও প্রথমে বাস্তব ঘটনার সূত্র ধরেই এগোয়। মামাবাড়িতে প্রথমেই কথকের দিদিমা তাকে সেজ-দাদামশাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করান। কথক দেখলেন—

> "সেজ-দাদামশাই ইয়া শিঙ-বাগানো গোঁফ, হিংস্র চোখ, দিব্যি টেরিকাটা চুল নিয়ে ইজিচেয়ারে বালাপোশ গায়ে দিয়ে শুয়ে আছেন। বুকের ভিতর ধ্বক্ করে টের পেলাম শত্রু নম্বর ওয়ান! সেজ-দাদামশাইকে প্রণাম করতেই একটু মুচকি হেসে আমাকে মাথা থেকে পা অবধি দেখে নিয়ে বললেন, "হুঁ!""[৫]

সেজ-দাদামশাইয়ের মুখে ছোটকাকার লোহার সিঁড়ির গল্প, দিদিমার মুখে পুনরায় পদিপিসীর বর্মীবাক্স হারানোর কাহিনি, চিমড়ে ভদ্রলোকের বার রহস্যময় উপস্থিতি— এই সমস্ত ঘটনা তার সচেতন মনে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তৈরি করে। সে বুঝতে পারে, পরিবারের সকলেই যেন কোনো না কোনো গোপন সত্য জানে, কিন্তু কেউই পুরো সত্য প্রকাশ করছে না। এই অসম্পূর্ণ তথ্যই তার মানসিক কৌতূহলকে আরও তীব্র করে তোলে।

মনোবিজ্ঞানে বলা হয়, অসম্পূর্ণ তথ্য মানুষের মনে মানসিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে। সেই অস্থিরতা দূর করার জন্য মানুষ সত্যের অনুসন্ধান করে। পদিপিসির বর্মীবাক্স-এ কথকের মানসিক অবস্থাও ঠিক তেমনই। বর্মীবাক্স যেন তার কাছে একটি প্রতীক— অজানাকে জানার প্রতীক। তাই সে বারবার রহস্যের কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যায়।

এই পর্যায়ে প্রাক্-চেতন মন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ফ্রয়েডের মতে, প্রাকচেতন মন সচেতন ও অচেতন মনের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে। দিদিমার গল্প, সেজ-দাদামশাইয়ের স্মৃতিচারণ, পদিপিসীর সম্পর্কে শোনা নানা তথ্য, গজার উপাখ্যান— এসবই কথকের মনে সঞ্চিত হতে থাকে। তখন এগুলি তার কাছে সম্পূর্ণ অর্থবহ বলে মনে না হলেও প্রাকচেতন মনে সেগুলি সংরক্ষিত থাকে। দিদিমা যখন বলেন—

> "পদিপিসী একবার শীতকালে গোরুর গাড়ি চেপে কাউকে কিছু না-বলে রমাকান্ত নামে একটি সঙ্গী নিয়ে কোথায় জানি চলে গেলেন ফিরে এলেন দুপুর-রাত্রে। এসেই মহা হৈ-চৈ লাগালেন কি একটা নাকি বর্মিবাক্স হারিয়েছে।"[৬]

তখন কথক কেবল ঘটনাটি শোনে। কিন্তু এই ঘটনাই পরে তার অনুসন্ধানের অন্যতম ভিত্তি হয়ে ওঠে। অর্থাৎ যে তথ্য প্রথমে নিছক গল্প বলে মনে হয়েছিল, প্রাকচেতন মন সেটিকে সংরক্ষণ করে রেখেছিল এবং প্রয়োজনের সময় সচেতন মনে ফিরিয়ে আনে।

একইভাবে পদিপিসীর একমাত্র পুত্র গজার জীবনকাহিনিও প্রথমে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে হলেও পরে তা রহস্য সমাধানের অন্যতম সূত্রে পরিণত হয়। পদিপিসীর বর্মিবাক্সের কাহিনি বলতে বলতে একসময় দিদিমা বলেন—

> "হঠাৎ দেখা গেল গজার অবস্থা ফিরেছে। কথায়-কথায় বাড়িসুদ্ধ সবাইকে পাঠার মাংস খাওয়ায়, ঝুড়ি-ঝুড়ি সন্দেশ আনে। একবার সমস্ত চাকরদের গরম বেনিয়ান কিনে দিল। ঘোড়ার গাড়ি কিনল, হীরের আংটি কিনল। বাড়িসুদ্ধু সবাই থরহরি কম্পমান। কে জানে কোথা থেকে এত টাকা পায়! পদিপিসী অবধি চিন্তিত হলেন। অথচ চুরি-ডাকাতি করলে তো এতদিনে পেয়াদা এসে হানা দিত! টাকা ভালো, কিন্তু পায় কোথা?"[৭]

কারণ গজা দিন-রাত কেবল পান আর তামাক খেয়েই আকর্মার ঢেঁকি হয়ে দিন কাটাত। তাই এই বক্তব্য কথকের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে। যদিও কথক সঙ্গে সঙ্গে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হননি। কিন্তু প্রাক্-চেতন মন এই তথ্যকে ধরে রাখে। পরে গজার ডায়েরি পড়ে সেই তথ্যের অর্থ পরিষ্কার হয়। ফ্রয়েডের প্রাক্-চেতন তত্ত্বের এক চমৎকার সাহিত্যিক উদাহরণ এটি।

গল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রহস্যচেতনা ক্রমশ গভীর হতে থাকে। রহস্য আসলে মানুষের কৌতূহলকে দীর্ঘস্থায়ী করে। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায়, মানুষের মন অসম্পূর্ণতা সহ্য করতে পারে না। তাই অজানা বিষয়কে জানার প্রবল তাগিদ সৃষ্টি হয়। লেখিকা এই মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন।

চিমড়ে ভদ্রলোকের চরিত্র রহস্যচেতনা নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ট্রেন থেকে শুরু করে মামাবাড়ি পর্যন্ত চিমড়ে ভদ্রলোকের রহস্যজনক উপস্থিতি কথকমনে প্রথম থেকেই সন্দেহ সৃষ্টি করে। কথক একদিন ভোরে বারন্দা থেকে বাড়ির পাশের এক আমবাগানে প্রচণ্ড কুয়াশায় মুখে মাথায় কম্ফার্টার জড়িয়ে চিমড়ে ভদ্রলোককে চোখে বাইনাকুলার লাগিয়ে একদৃষ্টিতে বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেন। এদিনই দুপুরে কথক রান্নাঘর থেকে আনন্দ কোলাহলের শব্দ শুনে বিস্মিত হন। তিনি দেখতে পান চাকররা সকলে মিলে এক অপরিচিত ব্যক্তির আতিথেয়তা করছে। এমনকি কথকের পায়ের শব্দ শুনে সকলেই রান্না ঘর থেকে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়।—

> "কিন্তু একটা জিনিস আমার চোখ এড়াতে পারে নি। ঠ্যাং ছড়ানো রোগা লোকটা হচ্ছে আমাদের পরিচিত সেই চিমড়ে ভদ্রলোক। ভাবতে-ভাবতে গা শিউরে উঠল। এতদূর সাহস যে ভোরবেলা দুরবীন দিয়ে পরখ করে নিয়ে দুপুর না গড়াতে একেবারে ভেতরে এসে সেঁদিয়েছে। চুলগুলো আমার সজারুর কাঁটার মতন উঠে দাঁড়াল। বামুনদিদিকে জিঙ্গেস করলাম, "কে লোকটা?" বামুনদিদি যেন আকাশ থেকে পড়ল।
> "কোন লোকটা খোকাবাবু? তুমি-আমি ছাড়া আর তো লোক দেখছি না কোথাও।" বলেই সে সরে বসল, অমনি তার কোলের মধ্যে কতকগুলো রুপোর টাকা ঝনঝন্ করে বেজে উঠল। বুঝলাম এ ঘুষ দিয়ে চাকর সম্প্রদায়কে হাত করেছে! কি ভীষণ!"[৮]

আবার গভীর রাতে— "বিড়ি ধরাতে-ধরাতে যে বেরিয়ে এল বিড়ির আগুনে স্পষ্ট তাকে দেখে চিনলাম সেই চিমড়ে ভদ্রলোক— বগলে জুতো নিয়ে পা টিপে টিপে চলছে।"[৯]

এই দুটি ঘটনার মধ্যে লেখিকা কোনো ব্যাখ্যা দেন না। ফলে পাঠকের মনেও প্রশ্ন জাগে—এই ব্যক্তি কে? তিনি কেন গোপনে আসা-যাওয়া করছেন? তাঁর উদ্দেশ্য কী? এই উত্তরহীন প্রশ্নগুলিই রহস্যচেতনাকে ক্রমাগত তীব্র করে তোলে।

ফ্রয়েডের মতে, মানুষের অচেতন মন প্রতিটি অসম্পূর্ণ ঘটনার ব্যাখ্যা নিজস্বভাবে তৈরি করতে শুরু করে। কথকের ক্ষেত্রেও তাই ঘটে। সে নিশ্চিত হয়ে যায় যে চিমড়ে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই কোনো বড় ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত। অথচ বাস্তবে তখনও তার হাতে কোনো প্রমাণ নেই। অর্থাৎ তার অচেতন মন বাস্তবের শূন্যস্থান পূরণ করার চেষ্টা করছে।

রহস্যচেতনাকে আরও গভীর করে তোলে গোপন চিঠি। সেদিন রাতেই চিমড়ে ভদ্রলোককে দেখে যখন কথকের নাজেহাল অবস্থা তখন রাতের অন্ধকারে কথকের পায়ে ওই চিঠিটা উড়ে এসে জড়িয়ে যায়। তখন আবার সেজ-দাদামোশাই তড়িঘড়ি করে ঘর থেকে বেরিয়ে টর্চ জ্বালিয়ে কিছু একটা খুঁজছিলেন। উড়ে আসা সেই কাগজে লেখা—

> "শ্রীযুতবাবু বিপিন বিহারী চৌধুরীর কাছ হইতে ২০০ পাইলাম। স্বাঃ নিধিরাম শর্মা। পুঃ সব অনুসন্ধানাদি গোপন থাকিবেক।"[১০]

এই সংক্ষিপ্ত বার্তাটি গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। কথকের সচেতন মন সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না। কিন্তু তার প্রাকচেতন ও অচেতন মন এই তথ্যকে পূর্বে সংগৃহীত তথ্যের সঙ্গে যুক্ত করতে শুরু করে। সে সন্দেহ করে, সেজ-দাদামশাইও নিশ্চয়ই রহস্যের সঙ্গে যুক্ত। তখন—

> "চিঠিটা পাঁচুমামার নাকের সামনে নেড়ে বললাম, "ও-সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে বৃথা সময় নষ্ট করো না মামা! স্বয়ং সেজ দাদা-মশাই এতে ভীষণভাবে জড়িত আছেন, এই দেখ তার প্রমাণ!""[১১]

—এই মানসিক বিশ্লেষণই তাকে আরও সক্রিয় অনুসন্ধানীর ভূমিকায় নিয়ে আসে।

গল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্ত আসে যখন কথক ছাদে উঠে পায়রার খোপগুলির দিকে তাকায়। চারদিকে সব খোপে বাসা থাকলেও দুটি খোপ খালি। অন্য কেউ এই দৃশ্যকে গুরুত্ব না দিলেও কথকের মন সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে ওঠে। লেখিকা লিখেছেন—

> "হঠাৎ তাকিয়ে দেখি সব খোপে পায়রার বাসা, কেবল এক কোণে দুটো খোপ ছাড়া!"[১২]

এরপরই কথক অনুভব করে—

> "আমার গায়ের লোমগুলি খড় খড় করে একটার পর একটা উঠে দাঁড়াল আর পা দুটো তুলতুলে মাখনের মতন হয়ে গেল, কানের মধ্যে স্পষ্ট শুনতে পেলাম শোঁ-শাঁ করে সমুদ্রের শব্দ। যে আমি কোনোদিনও অঙ্কে চল্লিশের বেশি পেলাম না, সেই আমি কি তবে আজকে একশো বছর ধরে কেউ যা পায় নি সেই খুঁজে পাব?"[১৩]

এই প্রতিক্রিয়া কেবল উত্তেজনা নয়; এটি অচেতন মনের হঠাৎ সক্রিয় হয়ে ওঠার লক্ষণ। প্রাকচেতন মনে সঞ্চিত সমস্ত তথ্য— কাটা সিঁড়ি, গম্বুজ, গজার গল্প, স্বপ্নে পাওয়া ইঙ্গিত— সব এক মুহূর্তে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। ফলে সচেতন মন বুঝতে পারে, এখানেই হয়তো রহস্যের সমাধান লুকিয়ে আছে।

ফ্রয়েডের ভাষায়, অচেতন মন অনেক সময় সচেতন মনের আগে সত্যের আভাস পায়। কথকের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। সে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়াই গম্বুজে ওঠে এবং অবশেষে আবিষ্কার করে—

> "মাটিতে বসে দুহাত দিয়ে কুলুঙ্গির মধ্যে থেকে মাঝারি সাইজের একটা বাক্স নামালাম। কি আর বলব! তার রঙ একটুও চটে নি, একেবারে চকচক করছে, তার ঢাকনার উপর আঁকা ড্রাগনের সবুজ চোখ জ্বলজ্বল করছে।"[১৪]

এই আবিষ্কার আকস্মিক নয়; বরং দীর্ঘদিন ধরে সচেতন, প্রাকচেতন ও অচেতন মনে সঞ্চিত তথ্যের সমন্বিত ফল। ফলে বর্মীবাক্স উদ্ধার কেবল একটি রহস্যের সমাধান নয়; এটি মানুষের মনের অনুসন্ধানী প্রবৃত্তিরও বিজয়।

অতএব, গল্পের প্রথম থেকে বর্মীবাক্স আবিষ্কার পর্যন্ত সমগ্র ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে, কৌতূহল মানুষের সচেতন মনকে সক্রিয় করে, প্রাকচেতন মন বিভিন্ন তথ্যকে সঞ্চিত রাখে এবং অচেতন মন সেই বিচ্ছিন্ন তথ্যগুলিকে একত্রিত করে সত্য আবিষ্কারের পথ নির্দেশ করে। এই ত্রিস্তরীয় মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই 'পদিপিসির বর্মীবাক্স' একটি সাধারণ রহস্যগল্পের সীমা অতিক্রম করে গভীর মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য অর্জন করেছে।

খ. কথকের ভয়, স্বপ্ন ও অবচেতন মনের প্রকাশ:

'পদিপিসীর বর্মিবাক্স'-এ কৌতূহল, ভয়, স্বপ্ন ও রহস্যচেতনা পরস্পর বিচ্ছিন্ন কোনো উপাদান নয়; বরং একটির সঙ্গে অন্যটির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এই চারটি মানসিক প্রবণতা একে অপরকে প্রভাবিত করে গল্পের ঘটনাপ্রবাহকে ক্রমশ গভীরতর করে তোলে। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, গল্পের কিশোর কথক প্রথমে কৌতূহলের দ্বারা পরিচালিত হয়, পরে সেই কৌতূহল তাকে ভয়ের মুখোমুখি দাঁড় করায়। ভয়ের তীব্রতা তার অচেতন মনে নানা স্বপ্নের জন্ম দেয় এবং সেই স্বপ্ন আবার রহস্যের সমাধানের দিকে তাকে এগিয়ে দেয়। অর্থাৎ কৌতূহল থেকে ভয়, ভয় থেকে স্বপ্ন এবং স্বপ্ন থেকে রহস্য-উন্মোচন— এই ধারাবাহিক মানসিক যাত্রাই গল্পটির প্রধান শক্তি।

গল্পের শুরু থেকেই কথকের মনে একটি প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে থাকে— পদিপিসির বর্মীবাক্স আসলে কোথায়? সবাই বাক্সের কথা জানে, কিন্তু কেউ তার অবস্থান জানে না। এই অজানা বিষয়টি তার মনে প্রবল অনুসন্ধিৎসার সৃষ্টি করে। ফ্রয়েডের ভাষায়, মানুষের মনে যে অজানা বিষয়কে জানার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তা অনেক সময় অচেতন স্তরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গভীর মানসিক তাড়নায় পরিণত হয়। কথকের ক্ষেত্রেও তাই ঘটে। সে কেবল গল্প শুনে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না; বরং নিজেই সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য নেমে পড়ে।

এই অনুসন্ধিৎসাকে আরও তীব্র করে তোলে পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের আচরণ। সেজ-দাদামশাই, পাঁচুমামা, খেন্তিপিসি, চিমড়ে ভদ্রলোক— সকলেই বাক্সের প্রতি অস্বাভাবিক আগ্রহ দেখায়। ফলে কিশোর কথকের মনে ধারণা জন্মায়, নিশ্চয়ই এই বাক্সের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা সকলেই পেতে চায়। রহস্য যত গভীর হয়, কৌতূহলও তত বৃদ্ধি পায়। এই মানসিক অবস্থাই তাকে সাধারণ কিশোর থেকে একজন অনুসন্ধানীতে রূপান্তরিত করে।

গল্পে ভয়ের অনুভূতিও ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে। প্রথমে পুরনো বাড়ির বিশাল নিস্তব্ধতা, দীর্ঘ বারান্দা, ফাঁকা ঘর, অন্ধকার করিডর এবং রাতের নীরবতা পাঠকের মনে এক অদ্ভুত শিহরণ সৃষ্টি করে। প্রথম রাতেই দিদিমার মুখে পদিপিসীর কথা শুনে কথক এক অদ্ভুত ভয় অনুভব করেন। কথক দিদিমাকে বললেন—

> "পদিপিসীর নাম শুনে আমার বুক টিপটিপ করতে লাগল। "আলোটা রেখে যাও, তা হলে কিচ্ছু ভয় পাব না""[১৫]

তারপর মামাবাড়ির বিশাল ভবনের রাত্রিকালীন নিস্তব্ধতার বর্ণনায় কথকের বয়ানে লেখিকা লিখেছেন—

> "রাতের অদ্ভুত চুপচাপের মধ্যে শুনতে পেলাম দূরে হুতুমপ্যাঁচা ডাকছে, আর মাথার উপর পুরনো কাঠের কড়িগুলো মটমই করে মোড়ামুড়ি দিচ্ছে। বুঝতে পারছিলাম এ-সবের জন্য ঘুম ভেঙে যায় নি। যার জন্যে ঘুম ভেঙেছে সে নিশ্চয় আরো লোমহর্ষক।"[১৬]

এই পরিবেশ বাস্তব হলেও কিশোর মনের কাছে তা ভয়ংকর হয়ে ওঠে। কারণ শিশুমনের কল্পনাশক্তি বাস্তবের চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয়। ফ্রয়েড মনে করেন, অচেতন মনে জমে থাকা অজানা আশঙ্কা অনেক সময় বাইরের পরিবেশকে আরও ভীতিকর করে তোলে। এখানেও তাই হয়েছে।

চিমড়ে ভদ্রলোকের চরিত্র এই ভয়ের অনুভূতিকে আরও জটিল করে তোলে। তিনি কখনো হঠাৎ উপস্থিত হন, কখনো নিঃশব্দে অদৃশ্য হয়ে যান। গভীর রাতে সেজ-দাদামশাইয়ের ঘর থেকে তাঁর বেরিয়ে আসার দৃশ্য কথকের মনে ভয়ের সঙ্গে সন্দেহও সৃষ্টি করে। কথক বলে—

> "আমার তো আর তখন নড়বার-চড়বার ক্ষমতা ছিল না, তাই চুপ করে ভীষণ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম।"[১৭]

এই উক্তি কিশোর মনের আতঙ্ককে অত্যন্ত জীবন্তভাবে প্রকাশ করে। বাস্তবে কোনো বিপদ নাও থাকতে পারে, কিন্তু মানসিক ভয় বাস্তব বিপদের থেকেও অনেক বড় হয়ে ওঠে।

ভয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটে কথকের স্বপ্নে। ফ্রয়েডের মতে, স্বপ্ন হলো অচেতন মনের ভাষা। মানুষের চেপে রাখা ইচ্ছা, ভয়, আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি স্বপ্নের মাধ্যমে প্রতীকী রূপে প্রকাশিত হয়। গল্পে কথক স্বপ্নে পদিপিসীকে দেখতে পায়। পদিপিসী তাকে বলেন—

> ""বাক্স পেয়েছিস?" আমি বললাম, "কই না তো! নিমিষের মধ্যে বাক্স কোথায় ফেলেছিলে যে একবছর ধরে খুঁজে-খুঁজেও পাওয়া যায় নি, আমার আশা আছে যে আমি দুদিনেই খুঁজে দেব? কোথায় রেখেছিলে?... পদিপিসী বললেন, "ভালো করে খুঁজে দেখ। পেলে তুইই নিস।""[১৮]

আবার তিনি বলেন—

> ""...পাঁচুটা একটা ইডিয়ট, জোলাপের পর্যন্ত ডোজ ঠিক করতে পারে না, তুইই নিস। বাক্সের মধ্যে লাল চুনীর কানের দুল আছে, তোর মাকে দিস। আর দেখ, ঐ ব্যাটা চিমড়েটাকে আর ঐ বুড়োটাকে একেবারে কাইন্ড অফ বোকা বানিয়ে দিস। বিশ্বনাথের কৃপায় গজার আমার কোনো অভাব নেই, জুড়িগাড়ি কিনেছে, বাড়ি কিনেছে, গাঁজার ব্যবসা করেছে। আহা বাবা বিশ্বনাথ না দেখলে পাপিষ্ঠদের কী গতি হবে?" বলে আমাকে চুমু খেয়ে পদিপিসী ছোটকাকার তৈরি সেই কাঠের সিঁড়ি বেয়ে বাগানের দিকে চললেন, এবং পেছন ফিরতেই দেখলাম যে হাতটা পেছনে রেখেছিলেন তাতে ইয়া মস্ত এক গদা!"[১৯]

এই স্বপ্নকে নিছক অলৌকিক ঘটনা হিসেবে দেখলে ভুল হবে। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এটি কথকের অচেতন মনের প্রতিফলন। সারাদিন ধরে বাক্স, পদিপিসী, রহস্য এবং চিমড়ে ভদ্রলোক সম্পর্কে যা যা শুনেছে ও ভেবেছে, তাই রাতের স্বপ্নে নতুন বিন্যাসে ফিরে এসেছে। অচেতন মন তাকে যেন রহস্যভেদে উৎসাহিত করছে।

স্বপ্নে পদিপিসীর হাতে বিশাল গদা থাকার ঘটনাটিও প্রতীকধর্মী। গদা এখানে শক্তি, কর্তৃত্ব ও রক্ষার প্রতীক। বাস্তব জীবনে যাকে সে কখনো দেখেনি, সেই পদিপিসী তার কল্পনায় এমন এক শক্তিশালী নারীর

রূপ ধারণ করেন, যিনি সমস্ত বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম। এর মাধ্যমে কথকের মনে সাহসের সঞ্চার হয়। ফলে ঘুম ভাঙার পর তার মনে নতুন উদ্যম জন্মায়।

গল্পে রহস্যচেতনা কেবল বাক্সকে ঘিরেই সীমাবদ্ধ নয়। রহস্য তৈরি হয়েছে পুরনো বাড়ি, গোপন সিঁড়ি, গম্বুজ, গজার ডায়েরি, চিমড়ে ভদ্রলোকের অনুসন্ধান এবং পরিবারের সদস্যদের আচরণকে কেন্দ্র করেও। প্রতিটি নতুন ঘটনা পুরনো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আরও নতুন প্রশ্ন তৈরি করে। এই কৌশল পাঠকের মনেও কথকের মতোই অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্তটি আসে যখন কথক ছাদে উঠে গম্বুজের মধ্যে দুটি খালি খোপ দেখতে পায়। তখন—

> "... আমি তরতর করে গম্বুজের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে উপরে উঠে গেলাম। উপরে গিয়ে দেখি গম্বুজের চার দিকটা গোলপানা বটে কিন্তু মাঝখানটা ফোঁপরা, কেমন একটু ভিজে ভিজে গন্ধ, আর ভিতরের দেয়াল কেটে লেখা খোঁচা খোঁচা হরফে— "ইতি শ্রীগজার একমাত্র আশ্রয়।"[২০]

এই বাক্য রহস্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে দেয়। এরপর বর্মীবাক্সের আবিষ্কার কেবল একটি বস্তু উদ্ধার নয়; এটি দীর্ঘদিনের মানসিক অনুসন্ধানের সমাপ্তি। বাক্স খুলে কথক যখন লাল চুনির কানের দুল দেখে, তখন তার স্বপ্নের কথা মনে পড়ে যায়। বাস্তব ও স্বপ্নের এই সংযোগ গল্পটিকে মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা দিয়েছে।

গজার ডায়েরি পড়ে রহস্যের সম্পূর্ণ সমাধান হয়। সেখানে লেখা—

> "ঘটনাক্রমে গম্বুজের ভিতরকার এই নির্জন স্থান আবিষ্কার করিয়াছি। এখানেই আমার এই লিপি ও বাকি গুটিকতক অলংকার রাখিলাম। ইহাদের বিবাহাদি হইলে উপহার দেওয়া যাইবেক। ইতি শ্রীগজা।"[২১]

এই স্বীকারোক্তি প্রমাণ করে যে রহস্যের পেছনে কোনো অলৌকিক শক্তি নয়, বরং মানুষের সিদ্ধান্ত, ভয় এবং পরিস্থিতিই কাজ করেছে। ফলে গল্পের রহস্য বাস্তবতার মধ্যেই সমাধান লাভ করে। শেষ পর্যন্ত দিদিমা যখন সকলের মধ্যে অলংকার ভাগ করে দেন এবং বাক্সটি নিজের কাছে রেখে বলেন—

> "বাক্সটা কিন্তু আমি নিলাম, মসলা রাখব।"[২২]

তখন রহস্যের আবহ হালকা হাস্যরসে পরিণত হয়। দীর্ঘদিনের উত্তেজনার পর এই পরিণতি পাঠকের মনে মানসিক প্রশান্তি আনে। ফ্রয়েডের ভাষায়, দীর্ঘ মানসিক চাপের অবসান ঘটলে মানুষ হাস্যরসের মাধ্যমে মুক্তির অনুভূতি লাভ করে। গল্পের সমাপ্তিতেও সেই মানসিক মুক্তিই প্রকাশিত হয়েছে।

অতএব 'পদিপিসির বর্মীবাক্স'-এ কৌতূহল, ভয়, স্বপ্ন ও রহস্যচেতনা কেবল কাহিনির উপাদান নয়; এগুলি মানবমনের গভীর স্তরের বহিঃপ্রকাশ। ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের আলোকে বিচার করলে দেখা যায়, কিশোর কথকের সচেতন, প্রাকচেতন ও অচেতন মনের ক্রিয়াই তাকে রহস্যের সমাধানে পৌঁছে দেয়। এই কারণেই গল্পটি কেবল রোমাঞ্চকর কিশোর সাহিত্য নয়, বরং মানবমনের সূক্ষ্ম গতিবিধির এক অসাধারণ সাহিত্যিক নিদর্শন।

পরিসমাপ্তিতে এসে বলা যায়, 'পদিপিসির বর্মীবাক্স'-এ কৌতূহল, ভয়, স্বপ্ন ও রহস্যচেতনা কেবল গল্পের কাহিনিগত উপাদান নয়; এগুলি মানবমনের গভীর স্তরের শিল্পিত প্রকাশ। ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের আলোকে বিচার করলেও স্পষ্ট হয় যে, এই চারটি মানসিক উপাদানের আন্তঃসম্পর্কই গল্পটিকে একটি সাধারণ রহস্যকাহিনি থেকে উন্নীত করে মনস্তাত্ত্বিক গভীরতাসম্পন্ন সাহিত্যকর্মে পরিণত করেছে। তাই 'পদিপিসির

বর্মীবাক্স' বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে যেমন এক কালজয়ী সৃষ্টি, তেমনি মনস্তাত্ত্বিক সাহিত্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব অপরিসীম।

তথ্যসূত্র:

১. সরকার, সুনীল কুমার। ফ্রয়েড। শ্রীমহানামব্রত কালচার এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, ১৯৫৯, কলকাতা, পৃ. ২২।
২. মৈত্র, সমীর (সম্পা)। লীলা মজুমদার রচনাবলী। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, ১৩৬০, কলকাতা, পৃ. ১৮।
৩. তদেব, পৃ. ১৮।
৪. তদেব, পৃ. ১৮।
৫. তদেব, পৃ. ২৯।
৬. তদেব, পৃ. ৩৬।
৭. তদেব, পৃ. ৩৬।
৮. তদেব, পৃ. ৩৫।
৯. তদেব, পৃ. ৩৭।
১০. তদেব, পৃ. ৩৯।
১১. তদেব, পৃ. ৪০।
১২. তদেব, পৃ. ৪৪।
১৩. তদেব, পৃ. ৪৪।
১৪. তদেব, পৃ. ৪৪।
১৫. তদেব, পৃ. ৩১।
১৬. তদেব, পৃ. ৩২।
১৭. তদেব, পৃ. ৩৮।
১৮. তদেব, পৃ. ৩৮।
১৯. তদেব, পৃ. ৩৯।
২০. তদেব, পৃ. ৪৭।
২১. তদেব, পৃ. ৪৪।
২২. তদেব, পৃ. ৪৮।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. মৈত্র, সমীর (সম্পা)। লীলা মজুমদার রচনাবলী। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, ১৩৬০, কলকাতা।
২. সরকার, সুনীল কুমার। ফ্রয়েড। শ্রীমহানামব্রত কালচার এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, ১৯৫৯, কলকাতা।
৩. মিশ্র, পুষ্পা / মিত্র, মানবেন্দ্রনাথ। সিগমুন্ড ফ্রয়েড মনঃসমীক্ষণের রূপরেখা। নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, ১৯৯৪, কলকাতা।